IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ : কিছু প্রাসঙ্গিক কথা

কণিকা চক্রবর্তী
গবেষক, বাংলা বিভাগ
আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর

যুগ-যুগান্তর ধরে ভারত ভূখণ্ডের অন্তরালে লুকিয়ে আছে বিচিত্র সব উপকরণ। এখানে যেমন ঐতিহ্যের বাহার আছে তেমনি আছে রক্তাক্ত ইতিহাস। শুধু তাই নয় ভারত ভূমিকে কেন্দ্র করে সময়ে অসময়ে শাখা-প্রশাখা নিয়ে গড়ে উঠেছে নানা কাহিনি। ইতিহাসের পটভূমিতে সন্ধান করলে মিলে এমন বহু উদাহরণ। ঐতিহ্য ও বৈচিত্র্যতা অখন্ড ভারত- ভূখণ্ডের সৌন্দর্য। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে এখানে রক্তগঙ্গা কখনই বয়ে যায়নি। যখনই যিনি এখানে রাজত্ব স্থাপন করেছেন তখনই তার পূর্ব ইতিহাস রক্তগঙ্গার বন্যাই ছিল। তবে যে ঐতিহাসিক ঘটনার প্রতিফলনে আজও মানুষ ভুক্তভোগী তা হল ৪৭-এর দেশভাগ। এই দেশভাগ একদিনের ঘটনা নয়। এর পিছনে রয়েছে যুগান্তরের লড়াই। স্বাধীন দেশ প্রাপ্তির লড়াই ছিল বহুদিনের , বহু আশার, বহু আকাঙ্ক্ষার, ইংরেজ শাসনে ভারতবাসীর প্রাণ ওষ্ঠাগত। যেন তেন প্রকারে ভারত ভূমি থেকে ইংরেজ তাড়ানোই ভারতবাসীর সংকল্প হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু সেই সংকল্প আজও পূর্ণ সার্থকতা লাভ করতে পারেনি। রাজনীতির কুচক্রান্ত নিজ স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষকে খন্ডিত করে। ফলে জন্ম নেয় উদ্বাস্তু সমস্যা। হাজার হাজার লোক ভিটেমাটি ছাড়া হয়, হারায় আত্মপরিচয়, দুর্ভিক্ষ আর অনাহারের নগ্ন রূপ প্রকাশিত হয়। শুধু তাই নয় নানান রকমের অপরাধ সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। মানুষের চিরাচরিত দৈনন্দিন জীবনের অভ্যাস এক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়। বাঁচার তাগিদে মানুষ যেকোন রকমের অপরাধে জড়িয়ে পড়তে দ্বিধাবোধ করে না। ৪৭-এর দেশভাগ সোনার বাংলা কে এমনই রূপ দিয়েছিল। এই ছিল খন্ডিত

ভারতবর্ষের তৎকালীন ঝলক। কিন্তু এগুলো ঘটনার অদূর দূরবর্তী সদ্য বিভাজিত হওয়া পাকিস্তান নামক ভূ-খণ্ডে একই অবস্থা ঘটে যাচ্ছিল। কারণ তারাও তো দেশভাগের জন্য ভুক্তভোগী। পাকিস্তান ব্রিটিশ শাসক গোষ্ঠীর হাত থেকে আপাত মুক্তিলাভ করলে সেখানে দেখা দিল নতুন আরেক সমস্যা, বিভাজিত হলো পূর্ব পাকিস্তান। ১২শ' মাইল দূরত্বে অবস্থিত দুটি খন্ডের মধ্যে অমিল ছিল বিস্তর। (ভাষাগত ব্যবধান, দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবন যাপন, ভৌগলিক ব্যবধান, শিক্ষাগত ব্যবধান, নৃতাত্ত্বিক ব্যবধান) মিল ছিল একটাই, সে হলো ধর্মগত মিল । অর্থাৎ ধর্মগ্রন্থ কাঠামোর উপর ভিত্তি করেই বিভাজিত হলো ভারত পাকিস্তান। এর গূঢ় অর্থ বাইরে লোকে কেউ বুঝুক বা না বুঝুক কিছু স্বার্থান্বেষী শাসকগোষ্ঠী তা ঠিক বুঝতে পেরেছিল। ধর্মই যেখানে বিভাজন এর মূল সেখানে দাঙ্গা তো হবেই। ৪৭-এর দেশভাগে তাই যত্রতত্র দেখা দিয়েছিল হিন্দু-মুসলমানের ভয়ঙ্কর হিংসাত্মক রূপ। যাইহোক পাকিস্তানের পটভূমি কেবলমাত্র ইসলাম ধর্মকে গ্রহণ করলেও সেখানেও দেখা দিল বিভাজনের ভিন্নরূপ। অর্থাৎ মনন বিশ্বে যেখানে ভাইচারা, ভাতৃত্ববোধ নেই সেখানে একই ভূখণ্ড তো বার বার টুকরো হবেই। পাকিস্তানের মাটিতে তাই আবার শুরু হয় শাসক ও শাসিতের কিংবা শোষক ও শোষিতের লীলাখেলা। বৃহৎ ভূখণ্ডের পূর্ব পাকিস্তান অগত্যাই অনুভব করে ৪৭-এর দেশভাগ তাদের প্রকৃত অর্থেই স্বাধীনতা দিতে পারেনি। ক্ষমতাবান পশ্চিম পাকিস্তান দেশে শাসনের নামে সমস্ত ক্ষমতা নিজ হাতে নিয়ে আপন শাসন কায়েম করে। অথচ ৫৬% ভোট তাদের আদায় করতে হয় পূর্ব পাকিস্তান থেকে। বৃহৎ বঙ্গবাসী মানব গোষ্ঠীকে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী তারা সহজেই বঞ্চিত করতে সমর্থ হয়। ফলে ব্রিটিশ ইংরেজির পরিবর্তে মাথাচাড়া দিয়ে উঠল নতুন এক গোষ্ঠী। তাদের ধারণা ছিল কেবলমাত্র ধর্মের দোহাই দিয়ে তারা চিরকাল সহজ সরল বঙ্গবাসীদের শোষণ করে যাবে। দীর্ঘ দু'শো বছরের ব্রিটিশবিরোধী লড়াইয়ের পর পূর্ব পাকিস্তানকে আবার নতুন করে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে হলো। স্বাধীনতার পর যে সমস্ত নতুন নতুন ধারায় দেশে শাসনের কার্যক্রম শুরু হয় তাতে দেখা দিতে থাকলো নানারকম ফাঁকফোকর। নিতান্ত সহজ-সরল বাঙালির মগজ ধোলাই পূর্বে হয়ে থাকলেও চেতনার স্ফুরণ কিন্তু পঞ্চাশের পর শুরু হয়। ১৯৫২ সালে পাকিস্তান ভূখন্ডে ঘটে যাওয়া ভাষা আন্দোলন এর জ্বলন্ত এবং সত্বর প্রতিক্রিয়া বহন করে। বাংলা ভাষার অবহেলা ও অপমান সহ্য করা কোনো বাঙালির পক্ষেই তখন সম্ভব ছিলো না। তাই পূর্ব পাকিস্তানের এক হয়ে

যাওয়া খুব কঠিন ব্যাপার ছিলো না। ১৯৫৮ সালের আয়ুবীয় শাসন প্রতিবাদের আরও একটি অংশ। বিরোধিতার মুখ্য একটি অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায় ১৯৬২ এর ছাত্র আন্দোলন। ঢাকা শহরের সমস্ত ছাত্র গোষ্ঠী বঙ্গভাষাকে রক্ষা করার জন্য সংকল্পবদ্ধ হয়। ১৯৬৩ -তে প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশন অর্ডিন্যান্স জারি করা হয়। ১৯৬৪-সালে বাঙালি ও বিহারিদের মধ্যে আবার ভাষাগত লড়াই দেখা দেয়। ১৯৬৫ সালে মৌলিক গণতন্ত্রী নির্বাচন ও ভারত পাকিস্তানের আবার দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। যুদ্ধের সময় পূর্ববাংলার অবস্থা-

" যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া পাকিস্তানের দুই প্রদেশে দুই রকম হয়। যুদ্ধের সতের দিন পূর্ববাংলা ছিল পশ্চিম পাকিস্তান ও বাকি পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন। প্রতিরক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা না থাকায় নিরাপত্তার জন্য এদেশকে সম্পূর্ণত ভারতের দয়ার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়তে হয়। তদুপরি এ সময়ে এখানে শিল্পজাত ও অন্যান্য জিনিসের দাম বেড়ে যায়। কিন্তু ভালো দিক হল যে, যুদ্ধে বাঙালি সৈনিকদের কৃতিত্ব, বিশেষত লাহোর রণাঙ্গনে ও আকাশ যুদ্ধে তাদের অপরিসীম সাহস ও শৌর্য বীর্য, বাঙালির মনে প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদা এনে দেয়।"১

১৯৬৬ সালে ছয়দফা । সেই সময় রবীন্দ্র নজরুল চর্চা ইত্যাদি ভারত ও পূর্বপাকিস্তানে প্রচন্ড জনপ্রিয়তা অর্জন করে। কিন্তু সেই সময় পশ্চিম পাকিস্তানের বেতার মন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দীনের ধর্মীয় প্রতিক্রিয়া -

"রবীন্দ্র সঙ্গীতের ভাব ভাষা ও সুরের কোনটার সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের তৌহিদবাদী জনসাধারণের তিলমাত্র যোগ নাই। রবীন্দ্রনাথের ঐশ্বর্য ও কৃষ্টি পূর্বপাকিস্তানী তমুদ্দনের সম্পূর্ণ বিপরীত।"২

ফলে ১৯৬৭- তে রবীন্দ্র সংগীত বিষয়ক জটিলতা দেখা দেয়। ১৯৬৮ সালে আগরতলা ষড়যন্ত্র প্রকাশ পায়। গণঅভ্যুত্থান হয় ১৯৬৯ সালে। পশ্চিম পাকিস্তানের পূর্ব অবস্থায় পূর্ব পাকিস্তানকে অত্যন্ত অবহেলার চোখে দেখলেও এতসব আন্দোলনের পর তারা উপলব্ধি করতে পারে সমগ্র পাকিস্তানে আপন অধিকার কায়েম করা এত সহজ বিষয় নয়। তখন প্রয়োজন ছিল ভ্রাতৃত্ববোধের। কিন্তু পাকিস্তান সরকার তা না করে হিংসার পথ অবলম্বন করে। ফলে পশ্চিম পাকিস্তান কেন্দ্রিক সামরিক জান্তা সরকার ১৯৭১ সালের ২৫ শে মার্চ রাতে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের বিরুদ্ধে অপারেশন সার্চলাইট পরিচালনা করে এবং নিয়মতান্ত্রিক গণহত্যা শুরু করে। আর এই গণহত্যায় কেবলমাত্র সাধারণ মানুষ মারা যাননি, এই

শ্রেণীতে ছিল ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, ধর্মীয় সংখ্যালঘু পুলিশ, ই. পি.আর কর্মকর্তা ইত্যাদি।

১৯৪৮ সালে দেশভাগের পর গোটা পাকিস্তানে যখন উর্দু ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয় তখন সারা বাংলার চেতনার স্ফুরণ হয়। শুধু ভাষার ক্ষেত্রেই নয় সমগ্র সরকারি উচ্চপদস্থ কর্মচারী পদে পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষমতাবান মানুষরাই আসীন হয়। ১৯৪৮ এর ২১ শে মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বিপুল জনগোষ্ঠীর মাঝে মহম্মদ আলি জিন্না স্পষ্টই ঘোষণা করেন পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা উর্দু হবে। ফলে বাঙালি জনগোষ্ঠীর অন্তরে ক্ষোভের জন্ম হয়। একমাত্র রাষ্ট্রভাষা উর্দু হলে বাঙালি জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব সংকটে বিষয়টি উপলব্ধি করা মাত্র পূর্ব পাকিস্তানবাসীর মধ্যে চাপা উত্তেজনা প্রকাশ পায়। বাঙালি জনগোষ্ঠী উপলব্ধি করতে পারে পাকিস্তান সরকারের হাতে বাংলা ভাষার সাহিত্য ও সংস্কৃতির অস্তিত্ব সংকটে। পাকিস্তান সরকার লিয়াকত আলি খান এবং খাজা নাজিম উদ্দিন এরা প্রত্যেকেই রাজ্যশাসনের একই নমুনা দেখালেন। ভুক্তভোগী বাঙালির অন্তরে দিনে দিনে ক্ষোভের আগুন বাড়তেই থাকে। পাকিস্তানে তখন মুসলিম লিগ, ছাত্রলিগ, রাষ্ট্রভাষা, সংগ্রাম কমিটি, আওয়ামী মুসলিম লিগ প্রভৃতি বিভিন্ন দলের সদস্যদের নিয়ে গঠন করা হয় 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ'। ১৯৫২ সালের ৪ ই ফেব্রুয়ারি বাংলা ভাষাকে অবহেলা করার চরম নিন্দা জানিয়ে শুরু হয় তীব্র আন্দোলন। 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' -এর উদ্যোগে এই আন্দোলন শুরু হয় এবং দাবীকৃত না হওয়া পর্যন্ত এই আন্দোলন চলার সিদ্ধান্ত ও নেওয়া হয়। এই সভাতেই ২১শে ফেব্রুয়ারি বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে সারা বাংলা জুড়ে ধর্মঘট শুরু হয়। ধর্মঘটের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল ছাত্রগোষ্ঠী, জড়িয়ে পড়লেন বহু শিক্ষক, বুদ্ধিজীবীর দল। পোস্টার ও ব্যানার ছেয়ে পড়ে সারা ঢাকা শহর। এই জনগণ, কোলাহল দমিয়ে রাখার জন্য পাকিস্তান সরকার ১৪৪ ধারা জারি করে। অর্থা□ আপাতকালীন নীরবতা ঢাকা শহর জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু তাতে বিশেষ লাভ হলো না। ক্ষোভের আগুন ভিতরে ভিতরে আরও তীব্র হয়ে উঠেছিল। ঢাকা শহরে বাঙালিদের বিরুদ্ধে পাকিস্তান সরকার যুদ্ধ ঘোষণা করলে পাকিস্তানের সৈন্য বাহিনী অহরহ বাঙালি ছাত্রসমাজে আক্রমণ করতে শুরু করে। কাঁদানো গ্যাস, লাঠিচার্জ ইত্যাদির মাধ্যমে দফায় দফায় যুদ্ধ হতে থাকে। বিক্ষুব্ধ জনতাকে দমন করতে পুলিশ ছাত্র মিছিলে গুলি

পর্যন্ত চালাতে শুরু করে। পুলিশের নির্মম অত্যাচারে সেসময় রফিক, সালাম, বরকত, জবার প্রমুখ নিহত হন। বাংলার বুকে ঝরে পড়ে তাজা রক্ত। বেদনাদায়ক এই খবরটি সারা বাংলায় ছড়িয়ে পড়লে রাস্তায় রাস্তায় হাজার হাজার মানুষ শহীদ ছাত্রদের পক্ষে তীব্র আলোড়ন তোলে। এই নির্মম অত্যাচারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে সেদিন আইন পরিষদের ভেতরেও শুরু হয় তুমুল উত্তেজনা। মওলানা তর্কবাগীশ, ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, মনোরঞ্জন ধর, বসন্তকুমার দাস প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এই হত্যাকাণ্ডের তীব্র বিরোধিতা জানিয়ে পরিষদ কক্ষ ত্যাগ করেছিলেন। পরদিন মিছিলে সরকারী কর্মচারী সহ বহু যুবক তীব্র ক্ষোভের সাথে যোগদান করেন। দেখতে দেখতে বাংলার মিছিল ভীষণ রূপ ধারণ করে। তখন তারা নিজেদের পরিচয় বাঙালি বলেই মনে করে। হিন্দু-মুসলিম জাত বিভাজন তো পরের কথা।

তথ্যসূত্র :

১ । সাঈদউর রহমান; পূর্ববাংলার রাজনীতি সংস্কৃতি ও কবিতা; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; ১৯৮৩; ঢাকা; পৃ: ৬৮ ।

২ । দৈনিক ইত্তেফাক; ২৬.৬.১৯৬৭; স্বাধীনতার দলিল পত্র’ ২য় খন্ড’ পৃ: ২৮১ ।